বর্শেলের বিড়ম্বনা

(গল্পগ্রন্থ – রূপহলুদ)

‘বর্শেল’ অর্থাৎ বঁড়শি ও ছিপ দিয়ে মাছ মারতে যে পটু। এক কথায় ওস্তাদ মৎস্যশিকারী। লাঠি যে চালাতে পটু সে হল ‘লেঠেল’, ছিপ-বঁড়শি বাইতে যে পটু সে হল ‘বর্শেল’।

এই সামান্য ভূমিকার দরকার ছিল এই জন্যে যে অনেকেরই ‘বর্শেল’ কথাটির অর্থ জানা নেই হয়তো—প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা প্রয়োজন যে, যেমন লাঠি হাতে নিয়ে সবাই বেড়ায়, কিন্তু সবাই লেঠেল নয়, তেমনি ছিপ দিয়ে মাছ সবাই ধরে, কিন্তু তারা বর্শেল নয়।

আমাদের গাঁয়ের রামহরি হোড় নামজাদা বর্শেল, আশপাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে তাঁর নাম বর্শেল হিসাবে প্রসিদ্ধ। ‘তাঁর’ ব্যবহার করলাম এজন্যে যে, রামহরি বনেদী ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান আমাদের গাঁয়ের— লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বড় বড় গোঁফ, চোখ বড় বড় ও রাঙা। আমরা ছেলেপুলের দল তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে চলি, বড় রাশভারী লোক। আগে অবস্থা খুব ভাল ছিল, এখন বিষয়-সম্পত্তির সামান্যই অবশিষ্ট আছে, তারই আয়ে অতি কষ্টে সংসার চলে। রামহরি জীবনে কারো চাকুরি করেননি, এখন তিনি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেচেন—সুতরাং এ বয়সে পরের দাসত্ব আর স্বীকার করবেন না এটা নিশ্চয়।

কিন্তু মাছ ধরা সম্বন্ধে একজন ‘অথরিটি’ তিনি। বহু লোক এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে।

—হ্যাঁ হোড়মশাই, গাঙে কি চার করে রাখবো আজ?

—কিসের চার দিচ্ছ?

—গোবর আর কেঁচো।

—নতুন বর্ষার জল, তুষ আর কুঁড়ো দাও।

তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্তৃত। কে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করবে? হোড়মশায় জীবনে অনেক আশ্চর্য ধরনের বড় মাছ ধরেচেন, তাঁর মুখে সে-সব গল্প শুনলে আহারনিদ্রা ভুলে যেতে হয়। অবিশ্যি আমাদের মত ছেলেমানুষের সঙ্গে সে-সব গল্প তিনি কখনো করতেন না, বড় লোকেদের সঙ্গে বসে বলতেন, আমরা বসে শুনতাম।

এসব পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলচি, আগেই বলে রাখি।

আমার তখন বারো-তেরো বছর বয়েস। আষাঢ় মাস, খুব বর্ষা হয়ে গিয়েচে, মাঠে-ডোবায় জল থৈ-থৈ করচে।

হাবুল বল্লে, মাছ ধরতে যাবি সন্তুদা? জটেমারির খালে বড় বড় বান মাছ আর জিওল মাছ পড়চে!

—কে বল্লে ?

—কাল গোপাল আর নেড়াকাকা এই বড় বড় বান মাছ ধরে এনেচে।

—তোর বড় ছিপ আছে? আমায় একখানা দিবি?

—দুখানা মোটে আছে—বাকি তিনখানা পুঁটিমাছ-ধরা ছিপ।

বেলা তিনটের পর আমরা চারজন সমবয়সী বন্ধু জটেমারির খালে কাঠের পুলের নীচে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—রামহরি হোড় সেখানে তাঁর লম্বা লম্বা ছিপগুলো নিয়ে দস্তুরমতো চারকাঠি পুঁতে একমনে গম্ভীর মুখে একা বসে।

সন্তু প্রশংসাসূচক বিস্ময়ের সুরে বল্লে—রামহরি জ্যাঠা মাছ ধরচে!

আমি বল্লাম কই?

—ঐ দ্যাখ্ ঐ গাছের নীচে।

আমার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো। মস্ত-বড় বর্শেল রামহরি জ্যাঠা দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে মাছ ধরতে বসেচেন। যদি মাছ ধরতে হয়, তবে ওঁর আশেপাশে বসে। নয়তো মাছ হবে না। যে যে-সাধনায় সিদ্ধ তার শরণাপন্ন না হলে সে-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

আমি বল্লাম—চল্, রামহরি জ্যাঠার ডাইনে ওই ফাঁকা জায়গাটায় ছিপ ফেলি।

হাবুল বল্লে—উনি যদি বকেন?

—বকেন তো বকবেন, দেখছিস্ নে, ওঁর চারে বড় বড় মাছ সব আসতে শুরু করেচে। অমন ওস্তাদ এ দেশে নেই। কি দিয়ে চার করতে হয়, কিসে বড় মাছ আসে, এ উনি যেমন জানেন, এমন কেউ জানে না।

আমরা পাশে বসবার উদ্যোগ করচি, রামহরি বর্শেল কিন্তু সেটা তত প্রীতির চক্ষে দেখলেন না। একটা কারণ হচ্চে, তিনি মাছ জড়ো করবার মশলা ছড়িয়েচেন জলে, এখন অন্য কেউ এসে তাঁর তৈরি জমিতে চাষ করুক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয়ত আমরা চঞ্চল বালক, তাঁর মত চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না, গোলমাল করবোই। তা হলে মাছ আসবে না চারে। ভয় পেয়ে ভেসে যাবে।

রামহরি হোড় তুরীয় অবস্থা থেকে নেমে এসে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এই! ওখানে বসবি নাকি?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আপনার পায়ে পড়ি কিছু বলবেন না আমাদের।

রামহরি বিরক্তিপূর্ণ মুখে বল্লেন—যতো আপোদ! আর জায়গা পেলি নে? আচ্ছা চুপ করে বোস্। কেউ কথাটি কইবি নে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ছিপ ফেলেচি আমরা, কিন্তু একটা মাছও ঠোক্‌রায় নি। গোলমাল না করি, কথাবার্তা চলচে সমানে। ক্রমে কথাবার্তার সুর চড়লো।

পচা বল্লে—ওই ক্ষেতটাতে কাঁকুড় হয়েচে, সন্তু যা—গোটা-চারেক কচি দেখে কাঁকুড় তুলে আন—

রামহরি বর্শেল ওদিক থেকে ধমক দিয়ে বল্লেন—এই সব, কি হচ্চে?

আমরা ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে হাবুল এবং পচা বাবলা কাঁটার নীচু বেড়া ডিঙিয়ে অদূরবর্তী কাঁকুড়ের ক্ষেতে ঢুকে পড়লো এবং তিনটে বড় বড় কাঁকুড় নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

গণ্ডগোল বাধলো কাঁকুড়ের ভাগ নিয়ে।

আমি বল্লাম—তোমরা ভাগ বেশি নেবে কেন? সমান ভাগ করো। আমি তোমাদের ছিপ নিয়ে চৌকি না দিলে তোমরা কাকুড় আনতে পারতে?

পচা বল্লে—আমি বড়টা তুলেচি, ওটা আমার।

যতীশ নাপিতের ছেলে কেষ্ট বল্লে—তা কেন? সমান ভাগ হবে!

রামহরি আবার ধমক দিয়ে বল্লেন—ওসব কি হচ্চে রে? মাছ ধরতে এসেছিস্, না কাঁকুড় খেতে এসেছিস্ এখানে?

আমি বল্লাম—মাছ মোটে ঠোক্‌রাচ্চে না জ্যাঠামশায়!

—কি করে মাছ ঠোক্‌রাবে? তোমাদের তো মাছ ধরা নয়, মাছ-ধরা খেলা। কি জানিস্ তোরা মাছ ধরার ? সব ক'টাতে জুটে হুটোপাটি করচিস্ আর কাঁকুড় চুরি করচিস্ পরের ক্ষেত থেকে! মাঝে পড়ে আমারও মাছ হল না তোদের গোলমালে। নইলে যা চার করেছিলাম, কুঁড়ো দিয়ে আর পুরনো তেঁতুল—

রামহরি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উত্তেজনার মুখে মৎস্য-শিকারের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করে ফেলেছিলেন আর একটু হলে।

আমি চুপি চুপি বল্লাম—ওই শুনে রাখ, কুঁড়ো আর পুরানো তেঁতুল—এই দিয়ে চার করতে হবে বুঝলি তো! ভুলে বলে ফেলে দিয়েচেন—

হাবুল ছিপ একখানা জল থেকে তুলে বল্লে—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না!

রামহরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছিপটার দিকে চেয়ে বল্লেন—ও কি বহর দিয়েছিস? তোদের সবই হল ছেলেখেলা! জল মেপে বহর দিতে হয়।

আমি আগ্রহের সুরে বল্লাম—সে কি করে করতে হয় জ্যাঠামশায়?

জল মেপে নিস্‌নি?'

—তা তো জানিনে।

রামহরি দাঁত খিচিয়ে বল্লেন—তা জানবে কেন? জানো কাঁকুড় চুরি করতে! ঢিল বেঁধে সুতো জলে ছেড়ে দ্যাখো কতটা ভিজেছে—সেখানে ফাত্‌না তুলে বাঁধো—তাকে বহর দেওয়া বলে। দেখি?

আমি ছিপ তুলে দেখাতে রামহরি বর্শেল সেদিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বল্লেন—আড়াই হাত বহর দে।

সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। রামহরি বর্শেল স্বয়ং আমাদের বহর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েচেন! এইবার মাছ না হয়ে যায়?

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পরে আমাদের মধ্যে আবার গুঞ্জন-রব উত্থিত হল এবং খুব শীগ্‌গির সে গুঞ্জন কলরবে পরিণত হয়ে গেল। এবার গোলমাল বাধলো ছিপের বহর নিয়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ ধরতে ব্যগ্র।

পচা বল্লে—আমায় ছিপ দাও—আমি নিজে বহর দিই।

আমি বল্লাম—তুই কি বুঝিস বহরের? আমায় দে, দিয়ে দিচ্চি।

—থাক্, তোর আর ওস্তাদি করতে হবে না—ঢের হয়েচে!

—মুখ সাম্‌লে কথা কবি সন্তু।

—তুই মুখ সাম্‌লে—

আমাদের সুর তখন পঞ্চমে উঠেচে। রামহরি বল্লেন—কি বিপদেই পড়েচি এদের নিয়ে! আজ যে আমার চার করাই মাটি হল দেখচি এদের জ্বালায়! তোরা বাপু অন্য জায়গায় যা— ওঠ ওখান থেকে—বেরো—

আমরা তাড়া খেয়ে ছিপ গুটিয়ে সেখান থেকে উঠে আর কিছু দূরে গিয়ে বসলাম। একটা কাশঝোপের আড়াল থাকার দরুন সেখান থেকে রামহরি বর্শেলকে ভাল করে দেখা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সামনের ছোট খালে কচুরিপানার দামে নীল ফুল ফুটেচে, বর্ষার জল থৈ-থৈ করচে খালের কানায় কানায়। ওপারের চরে আরামডাঙা গ্রামের বাঁশ-খেজুর-তালগাছের শীর্ষ বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের তলায় একটি শ্যামল সরলরেখা রচনা করেচে। দু-একটা সাদা বক জলের ধারে পানা শেওলার দামের ওপর চরে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনে আমরা রামহরি জ্যাঠার দিকে চাইলাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একটা বড় ছিপ দু-হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে তুললেন—এটুকু আমরা দেখলাম। তারপর তিনি বলে উঠলেন—যাঃ—

হাবুল বল্লে—রামহরি জ্যাঠা মস্ত বড় মাছ বাধিয়েচে, চল্ গিয়ে দেখি—

সবাই মিলে তখনি ছুটে গিয়ে শুনলাম প্রকাণ্ড মাছ বেধেছিল ওঁর ছিপে, কিন্তু উনিটান দিতেই ছিপের আগা ভেঙে নিয়ে মাছটা পালিয়েচে। সত্যি দেখি, বড় একটা ছিপের আগার দিকটা ভাঙা, ছিপটা হাতে করে বোকার মত রামহরি দাঁড়িয়ে।

আমাদের দেখে বিরক্তির সুরে ঝাঁজের সঙ্গে তিনি বল্লেন—তোদের জন্যে আজ সব মাটি! না দিলি চারে মাছ আসতে, না দিলি সুস্থ হয়ে মাছ ধরতে। সেই বেলা তিনটে থেকে পেছনে লেগেচিস্ বাপু, মাছ ধরতে আসিস্ কেন তোরা? কি বুঝিস্ মাছ ধরার? এ কি ছেলের হাতে পিঠে? এত বড় মাছ খেলে, তোদের জ্বালায় তুলতে

পারলাম না, সুতো কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল। নাঃ, আজ আর মাছই ধরবো না! কাল থেকে আমার ত্রিসীমানায় বসতে দেবো না বলে দিচ্চি—

রামহরি জ্যাঠার যত রাগ আমাদের ওপর এসে পড়েচে বুঝলাম। নইলে তাঁর মাছ পালিয়ে গেল সুতো কেটে, তাতে আমাদের অপরাধ কোথায় ? হাবুল নীচু সুরে বল্লে—বা রে, উনি পচা সুতো নিয়ে মাছ ধরতে এসেচেন, তাতে আমাদের দোষ বুঝি? আমরা মাছকে শিখিয়ে দিইনি তো—

যাহোক্, রামহরি জ্যাঠা তো ছিপ গুটিয়ে চলে গেলেন। তারপরেই যে ঘটনাটি ঘটলো, আমাদের মত বালকের জীবনে সেরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

রামহরি জ্যাঠা চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ আমার নজর গেল বাঁ-দিকের শেওলা-দামের ধারে একটা সাদা শরের ফাত্না একবার ডুবচে একবার উঠচে। আমার কথায় হাবুলও সেদিকে চেয়ে দেখলে। ফাত্নাটা ক্রমেই যেন ডাঙার দিকে আসতে লাগলো—অথচ খালের স্রোত তো এখন উল্টোদিকে বইচে, তবে ফাত্না ডাঙার ধারে আসচে কিসের জোরে ?

হাবুল বল্লে—তাই তো সন্তুদা, ওটা কি হচ্চে?

হঠাৎ আমিজিনিসটা বুঝতে পারলাম। রামহরি জ্যাঠার সেই ছিপের ফাত্না। বড় মাছ ওর তলায় বঁড়শিতে বেধে আছে। কথাটা যেমন মনে হওয়া, আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কিসের ঝাঁজ বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি। হাবুলকে বল্লাম—রামহরি জ্যাঠার সেই মাছটা। ও জখম হয়ে এসেচে বলে অবসন্ন হয়ে ডাঙার দিকে আসচে। জলে নামো সবাই।

হাবুল বল্লে—পচা, তুই ছেলেমানুষ আছিস, পরনের কাপড় খুলে ফেল্, মাছটাকে কাপড় দিয়ে জাপটে ধরতে হবে।

আমি বল্লাম—ভারী মাছ, খুব সাবধানে তুলবার চেষ্টা করো। জলের তলায় ওর কুমিরের মত শক্তি।

সবাই মিলে জলে নামলাম। ফাত্না ধরে সন্তর্পণে টান দিতেই জলের তলায় প্রকাণ্ড মাছ ঝটপট করে উঠে জল ছিটিয়ে আমাদের সারা গা ভিজিয়ে দিলে। আমাকে তো টেনেই নিয়ে গেল কিছুদূর—হাবুল আমার কোমর জড়িয়ে টেনে রাখলে। বল্লে—টান দিস্ নে, সুতো ছিঁড়ে যাবে—মস্ত মাছ—সাবধানে তোল্।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে মাছটা যুঝল। যারা কখনো বড় মাছ ছিপে ধরেচে, তারাই জানে এ ব্যাপার কি। এক-একবার এমন হল যে, মাছ বুঝি আর থাকে না, চোঁ-চাঁ ছুটলো বেশি জলের দিকে। তার চেয়েও ভয় ছিল ঘন কচুরিপানার দামের নীচে গিয়ে লুকুলে এ মাছের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

অবশেষে মাছটা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। মুখে আড়াই ইঞ্চি বঁড়শি নিয়ে কতক্ষণ পারবে? মাছ অবসন্ন হলে ক্রমশ আপনিই ডাঙার কাছে আসে। পচা সেই সময় কাপড় দিয়ে মাছটা জাপটে ধরলো—আমরা সবাই গিয়ে পড়লাম মাছটার ওপরে। টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, সের-পাঁচেক আন্দাজ ওজনের রুইমাছ।

গ্রামে ঢুকবার পথেই রামহরি বর্শেলের ঘর। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেচে, রামহরিজ্যাঠা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন। আমরা হৈ-হৈ করে আসচি দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন—কি রে ? মাছ পেলি নাকি?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাই। রামহরি জ্যাঠার নাকের সামনে দিয়ে বড় মাছটা নিয়ে যাবো!

দাওয়া থেকে নেমে এসে রামহরি বল্লেন, এত বড় মাছটা তোরা কোন্ ছিপে ধরলি ? তোদের সঙ্গে তো বড় ছিপ ছিল না!

আমি বল্লাম—হরকওলা বঁড়শির একখানা ছিপ আছে—এই যে!

রামহরি হাজার হোক, ওস্তাদ বর্শেল তো। আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—মাছটার নিতান্তই তা হলে মরণ ছিল! হরকওলা বঁড়শিতে পাঁচ সের রুইমাছ ওঠে, এ কখনো সম্ভব হয় না। তোদের ও ছেলেখেলা করতে গিয়ে এত বড় মাছটা জুটে গেল অমনি অমনি—নইলে ও-মাছ হরকওলা ছিপে ডাঙায় ওঠানো তোদের সাধ্যি ছিল? ওই যে বল্লাম, মাছটার কপালে নিতান্তই মৃত্যু ছিল আজ।

বাড়ি ফিরে রামহরি জ্যাঠার বাড়ি আমরা সের দেড়েক কাটা মাছ আর মুড়োটা পাঠিয়ে দিলাম।